জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১১, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২১

ঢাকার নগরায়ণ : ঢাকাই ভাষার ভূমিকা

মিথুন ব্যানার্জী*

Abstract

This research aims to explore the correlation between the urbanization process of capital city Dhaka and "Dhakai" language" spoken by the commoners of the old part of Dhaka. According to the historical description, people migrated from the outskirt areas of Mughal Dhaka and created a home-grown version of Dhakai language. The study finds that this linguistic form is highly influenced by a range of regional dialects, especially Bikrampuri and it stimulates the obscured history of the commoners. In fact, compare to Sukhobashi form (based on Urdu language), Dhakai language is used by non-elite, marginalized people who in reality stay outside of the all kinds of socio-political power framework. As a result, linguistic features of Dhakai language provide interesting information and cues regarding their lives and activities which are not taken place in the conventional history.

ভূমিকা

প্রায় চারশো বছর পূর্বে রাজধানী হিসেবে মুঘল শাসনের সূত্রে ঢাকা নগরে নগরায়ণের যে সূচনা হয়, তা আজও চলমান। এই নগরায়ণের নেপথ্যে রয়েছে ঢাকায় বাসরত বা স্থায়ীভাবে বাস করতে আসা আভিবাসী-প্রত্যাশী মানুষ। ক্ষমতার পালাবদলে বহু শাসকের শাসন-ইতিহাসের আড়ালে ছড়িয়ে রয়েছে ঢাকার নগরায়ণ বিকাশে সরাসরি অংশ নেওয়া সাধারণ মানুষের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ভাষা। বিশেষত নগর-ইতিহাস নির্মাণের সঙ্গে জনমানুষের সম্পৃক্তির অত্যন্ত কার্যকর মাধ্যম হলো জন-মানুষের মুখের ভাষা; যার সাহায্যে তারা তাদের সমস্ত সংজ্ঞাপন প্রক্রিয়া পরিচালনা করে থাকে। বর্তমান প্রবন্ধে ঢাকার নগরায়ণ ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জন-মানুষের ভাষিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আরও স্পষ্ট করে বলা যায় যে, ঢাকাই ভাষার বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব ঢাকার নগরায়ণের প্রেক্ষাপটে কীভাবে প্রাসঙ্গিক তা-ই মূলত এই প্রবন্ধে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রবন্ধটির শিরোনামে পরিসর নির্দেশক অংশের সঙ্গে ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ-লক্ষ্যকে সমন্বিত করা হয়েছে। ঢাকার নগরায়ণকে কেন্দ্র করে ঢাকার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বিশেষ করে বিক্রমপুর, মানিকগঞ্জ, জয়দেবপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি এলাকা থেকে শ্রমজীবী মানুষ ঢাকায় এসে বসতি স্থাপন করেছে। নগরায়ণের প্রারম্ভিক পর্যায়ে ঢাকার পরিপার্শ্ব থেকে আসা সাধারণ মানুষের ভাষার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে গড়ে উঠেছে নগর ঢাকার 'ঢাকাই ভাষা' যা বাংলা ভাষারই একটি বিশেষায়িত ঔপভাষিক রূপ। বর্তমান গবেষণায় নগরায়ণের প্রেক্ষাপটে পুরনো ঢাকা হিসেবে পরিচিত বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তর তীর ঘেঁষে গড়ে ওঠা আদি ঢাকায় প্রচলিত ঢাকাই ভাষার বিকাশ এবং এই ভাষার সঙ্গে বিক্রমপুরের ভাষার ভাষিক কাঠামোর সম্পর্ক অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

* সহকারী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

পটভূমি

শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে জন-মানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে এই নগর-সভ্যতা বিকশিত হয়। স্থানীয় ইতিহাস-চর্চায় জন-মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন প্রণালী, তাদের সংস্কৃতি– বিশেষ করে শাসক ও শাসিতের, পুঁজিপতি ও শ্রমিকের নিয়ত সংঘাতময় ক্রমবিকাশ অনুধাবন বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।[১] মানুষের সামাজিক ইতিহাস ও নগরায়ণের সঙ্গে তাই ভাষার রয়েছে গভীর সম্পর্ক। কেননা নগরায়ণের ফলে গ্রামে বাসরত জনগোষ্ঠী নগরে স্থানান্তরিত হয়।[২] প্রাথমিক অবস্থায়, নগর-অভিবাসী এই জনগোষ্ঠী সাম্প্রদায়িক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি বৃহৎ নগরের ক্ষুদ্র প্রান্তিক দলে পরিণত হয়। এই সমাজ-অর্থনৈতিক বাস্তবতা প্রভাব ফেলে তাদের ভাষা ব্যবহারের ওপর। উল্টো করে দেখলে এই প্রভাব সঞ্চারিত হয় নগরের প্রচলিত ভাষার ওপরও। নগরায়ণের সঙ্গে ভাষার এই সম্পর্ককে অনেক ভাষাবিজ্ঞানী[৩] সমাজভাষাবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে মনে করেন। আবার অনেক ভাষাবিজ্ঞানী ভাষা-বিপন্নতা বৃদ্ধির কারণ হিসেবে নগরায়ণের এই বিস্তারকে দায়ী করে থাকেন।[৪] যেভাবেই দেখা হোক না কেন, নগরায়ণের সঙ্গে নগরের ভাষার সম্বন্ধ যে নিবিড় তা অনুধাবন করা কষ্টসাধ্য নয়। তাই নাগরিক জীবন-কাঠামোর বিভিন্ন উপাদান নিয়ে ক্রমবিকশিত নগরায়ণের চিহ্ন থেকে যায় ভাষার দেহে। উদাহরণস্বরূপ, ঢাকার নগরায়ণ প্রক্রিয়া বিবেচনায় রেখে উল্লেখ করা যায় ঢাকাই ভাষায় ব্যবহৃত 'ভিস্তি' শব্দবন্ধটির কথা– যা ঢাকা নগরের প্রারম্ভিক নগরায়ণের কথা, বাড়িতে বাড়িতে পানীয় জল সরবরাহকারী একটি পেশাজীবী শ্রেণির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ঢাকা-কেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চায় এই ইতিহাস-চিহ্নিত অভিধাটির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। প্রসঙ্গত স্মরণীয় শামসুর রাহমানের স্মৃতিকথামূলক সাহিত্য *স্মৃতির শহর*-এ ভিস্তিওয়ালাদের এক অনবদ্য বর্ণনা পাওয়া যায়।[৫] একইভাবে স্মরণীয়, আর একটি শব্দ 'মেরাসিন'– অর্থ নারী গায়কের দল; যা ঢাকার নিজস্ব সংস্কৃতি ও বিশেষ জীবন-কাঠামোর ইতিহাসের প্রতিনিধিত্ব করে। লক্ষণীয় যে, উল্লিখিত দুটি শব্দই ঢাকার শ্রমজীবী জন-মানুষের জীবন পরিক্রমার ইতিহাসকেও একইসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেয়। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, একটি ভাষার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে রূপতাত্ত্বিক স্তরেই অধিকতর স্পষ্টভাবে ইতিহাসের বিভিন্ন উপাদান প্রোথিত থাকে। কেননা, ধ্বনি কিংবা বাক্যস্তরে যে ঐতিহাসিক উপাদান সংরক্ষিত থাকে, তা গভীর সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক ও কালানুক্রমিক গবেষণা এবং অনুধ্যানের বিষয়। ভাষার রূপ-ধ্বনিতাত্ত্বিক স্তর ভাষা ও ভাষীর পরিচয় লালন করে বলে বর্তমান আলোচনায় তা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে।

মুঘল রাজধানী হওয়ার সুবাদে ঢাকায় গত চার শ বছর ধরে জন-মানুষের মুখের ভাষা ক্রমবিকশিত হয়ে যে-ভাষা সৃষ্টি হয়েছে তা-ই ঢাকাই ভাষা। পুরনো ঢাকার ভাষা হিসেবে সুপরিচিত এই ঢাকাই ভাষা গড়ে উঠতে শুরু করে মধ্যযুগে এবং মুঘল আমলে; শেষটুকু নবাবি আমলে।[৬] এই ভাষার রূপবৈচিত্র্য নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। রফিকুল ইসলামের মতে[৭], ঢাকাই ভাষার তিনটি রূপ-বৈচিত্র্য রয়েছে: ক) ঢাকাই বাংলা, খ) ঢাকাই উর্দু এবং গ) প্রমিত বাংলা। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, প্রমিত বাংলা শুধু ঢাকা শহরেই প্রচলিত নয়; বরং সারা বাংলাদেশে প্রচলিত আনুষ্ঠানিক মান্যভাষা। পুরনো ঢাকায় দুইটি ভাষারূপের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায় : ক) কুট্টি ভাষা, খ) সুখবাস ভাষা। তিনি এই দুই ভাষারূপের পাশাপাশি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষা ও ভোজপুরি (প্রচলিত অর্থে বিহারি ভাষা) ভাষার উপস্থিতিও ঢাকাই ভাষায় লক্ষ করেছেন। আবার এরূপ বিবেচনাও অযৌক্তিক হবে না যে, ভৌগোলিক নৈকট্যের কারণে ঢাকাই

ভাষায় মানিকগঞ্জ, জয়দেবপুর, নারায়ণগঞ্জ এবং বিশেষ করে বিক্রমপুরের উপভাষার প্রভাব থাকতে পারে। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে, পুরনো ঢাকার স্থানীয় অথচ অ-মুসলিম জনগোষ্ঠীর ভাষার কথা; যার সঙ্গে বিক্রমপুরের উপভাষার বিশেষ সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। এরূপ সাদৃশ্য আলোচ্য ঢাকাই ভাষায়ও খুঁজে পাওয়া অসাধ্য নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বর্তমান প্রবন্ধে ঢাকাই ভাষার বাংলা ও উর্দু ভাষা মিশ্রিত (বাংলা প্রধান) ঢাকাই কুট্টি রূপ-কে বিক্রমপুরের ভাষার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে । পরিসরগত সীমাবদ্ধতার কারণে ভাষার মুখ্য চারটি স্তরের (ধ্বনি, রূপ, বাক্য ও বাগর্থ) মধ্যে ধ্বনি, রূপ, জন-মানুষের ডিসকোর্স ও প্রবাদ-প্রবচন বিশ্লেষণের মাধ্যমে বর্তমান প্রবন্ধের তুলনামূলক ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, 'নগরায়ণ' এবং 'জন-মানুষ' এই দুটো অভিধাকে বিশদ করা আবশ্যক।

নগরায়ণ

সাধারণত নগরায়ণ বলতে গ্রামীণ মানুষের একটি বিরাট দলের স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে নগরমুখী স্থানান্তর (shifting) -কে বোঝানো হয়। অর্থাৎ, নগরায়ণ হলো গ্রামীণ পরিবেশ থেকে আগত জনগোষ্ঠীর নগরে অভিবাসন গ্রহণ। Ritzer -এর মতে-

> Urbanization is the process whereby large numbers of people congregate and settle in an area, eventually developing social institutions, such as businesses and government, to support themselves.[৮]

প্রকৃতপক্ষে নগরায়ণ একটি ব্যাপক ও দীর্ঘকালিক প্রক্রিয়া। নগরায়ণের এই প্রক্রিয়ায় অংশ নেয় সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ। ফলে নগরকে ঘিরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে একটি বহুস্তরবিশিষ্ট পেশাভিত্তিক সমাজ কাঠামো। নগরায়ণের প্রারম্ভিক পর্যায়ে শাসকদের পরিকল্পনায় বা নগরায়ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী নগরে আসে এবং বেঁচে থাকার তাগিদে ক্ষমতাবান শ্রেণির অধীন হয়ে বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করে। এই অনিবার্য অধীনতা ক্রমশ নাগরিক হতে শুরু করা জন-মানুষের জীবনকে করে তোলে দ্বন্দ্বপূর্ণ। প্রায়শই দেখা যায়, বৈভব-নিয়ন্ত্রিত নগরায়ণ প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা-কাঠামোর ভারসাম্যহীনতার কারণে সাধারণ জন-মানুষ সচেতন কিংবা অসচেতনভাবে শিকার হয় আগ্রাসনের। অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলে গ্রাম থেকে আসা এইসব মানুষের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণ হয় না; ফলে দেখা দেয় আবাসন সংকটসহ বিভিন্ন রকম জীবন-সমস্যা। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে অতিসীমিত নাগরিক সুবিধা কোনো-না-কোনোভাবে তাদের ভাগ্যে জোটে, সেগুলোর প্রতি আগ্রহের কারণে এক ধরনের স্বপ্নবিভোর সান্ত্বনাঘেরা জীবনচক্রের দিকে তারা ধাবিত হয়। এই বাস্তবতার কারণেই নগরায়ণ প্রক্রিয়া সচল থাকে এবং একে নিয়ত প্রভাবিত করে চলে কিছু আর্থ-সামাজিক ও ভূ-রাজনৈতিক কারণ। এ কথা অনস্বীকার্য যে, নগরায়ণের ফলে নগরের ব্যাপক কর্ম-যজ্ঞে মানুষের অংশগ্রহণ মানুষকে নগরে বসতি গড়তে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। নগরের বিভিন্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ পেশা গ্রহণের সুযোগকে মানুষ প্রায়শই নিজেদের জীবন-উন্নয়নের উপায় হিসেবে বিবেচনা করে। জন-মানুষের কাছে প্রতিভাত হয় যে, নগর-ভিত্তিক ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা শাসক শ্রেণির বাস নগরেই। তারা জেনে যায় যে, নগর হলো ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল। ক্ষমতার পাশে থেকে ক্ষমতাবান হওয়ার আকাঙ্ক্ষাও জন-মানুষের একটি বিরাট অংশকে উদ্বুদ্ধ করে। তাছাড়া আপাত-নিয়ন্ত্রিত, বাহ্যিক শৃঙ্খলাপূর্ণ ও অধিক নিরাপদ বলে মনে হওয়া জীবন-পরিকল্পনা তাদেরকে নগরায়ণে উৎসাহিত করে তোলে। ফলে, মানুষ নগরে আসে এবং টিকে থাকার প্রাণান্ত চেষ্টা

চালিয়ে যায়। বিশেষ করে, গ্রামের দরিদ্র তথা ভূমিহীন নিঃস্ব জন-মানুষ ভাগ্যান্বেষণে এবং অনেকটা অনন্যোপায় হয়েই নগর-জীবনের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করে। তাছাড়া নগরে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অন্যান্য নাগরিক সুবিধার কথা বিবেচনা করার মধ্য দিয়ে মানুষ নগরায়ণের প্রতি আগ্রহী হয়; ক্রমশ বিস্তার লাভ করে নগর। আর এই ক্রমবিকাশমান নগরে জন-মানুষ ও জন-মানুষের সংজ্ঞার্থ নিরূপণ করা হয়ে ওঠে বিশেষভাবে তাৎপর্যমণ্ডিত।

জন-মানুষ

সাধারণত কোনো সমাজের শাসক-শাসিতের সম্বন্ধ অর্থাৎ ক্ষমতা ও অধীনতার মধ্যকার সম্পর্কজাল উন্মোচনের মধ্য দিয়ে জন-মানুষ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যেতে পারে। স্তরভিত্তিক সমাজে সামাজিক, অর্থনৈতিক, পদমর্যাদা, আভিজাত্য, বংশমর্যাদা বা কর্মসংস্থানের দিক থেকে সাধারণভাবে দুটো শ্রেণি চিহ্নিত করা হয়: ক্ষমতাবান ও ক্ষমতাহীন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ক্ষমতাহীনদের একটি উপশ্রেণি (subset) নিয়ে আন্তোনিও গ্রামশি তাঁর সাব-অল্টার্ন তত্ত্বে আলোচনা করেছেন। তিনি সাব-অল্টার্ন শব্দটি অধীন-শ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী বোঝাতে প্রথম ব্যবহার করেন।[৯] মূল ইতালিয়ান শব্দ 'সুবলতের্নো'-এর ইংরেজি রূপ হিসেবে বেছে নেওয়া হয় 'সাব-অল্টার্ন' শব্দ যা Subordinate শব্দের প্রায় সমার্থক। গ্রামশি মূলত দলিত শ্রেণি বোঝাতেই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর মতে, সমাজে যারা আধিপত্য প্রতিষ্ঠার যন্ত্রে সরাসরি অংশগ্রহণ করে না, কিন্তু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আধিপত্যের প্রতিফল ভোগ করে তারাই সাব-অল্টার্ন। অর্থাৎ সমাজের কর্তৃত্বহীন (non-hegemonic) গোষ্ঠীকেই তিনি সাব-অল্টার্ন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। অপরদিকে, এই কর্তৃত্বহীন বিশাল জনস্রোতকে রুদ্ধ করার প্রতিস্পর্ধীরূপে তিনি সমাজের অভিজাত শাসক শ্রেণি (rulling elite class) -কে শনাক্ত করেছেন। বস্তুত, অভিজাত শ্রেণি সাধারণত মূলধারার ইতিহাস-চর্চায় ব্যক্তি-মানুষ হিসেবে স্থানীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিনির্মাণে সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্তৃত্বহীনদের অবদানকে উহ্য রাখে। সাব-অল্টার্নের বাংলা পরিভাষা হিসেবে প্রচলিত রয়েছে 'নিম্নবর্গ', 'প্রান্তিক জনগোষ্ঠী' প্রভৃতি পরিভাষা। আপাত দৃষ্টিতে একটি সমাজের সাধারণ জন-মানুষকে এই কাঠামোতে ফেলে দেওয়াটা স্পর্ধার কাজ বলে মনে হতে পারে। তবে বাস্তবতার নিরিখে 'জন-মানুষ' অভিধার নিহিতার্থ অনুসন্ধানে ভিন্নতর ব্যাখ্যা স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। বলা যেতে পারে বিশ্বায়িত পুঁজিবাদ এবং বিভিন্ন দেশের অস্পষ্ট গণতন্ত্র-চর্চা এই সাধারণ জন-মানুষকে সাব-অল্টার্ন তথা নিম্নবর্গের সমীপবর্তী করে তোলে। কেননা, আধুনিক ছদ্মবেশী গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় সাব–অল্টার্ন ও জন-মানুষের যন্ত্রণা মূলত এক। ক্ষমতার মাপকাঠিতে শেষপর্যন্ত জন-মানুষও কর্তৃত্বহীন। মিশেল ফুকো ক্ষমতা কাঠামোকে বিশ্লেষণ করে এর তিনটি স্তর লক্ষ করেছেন।[১০] এগুলো হলো: ক্ষমতা প্রয়োগের মূলনীতি, ক্ষমতাকে ঘিরে শাসকের গৃহীত বিভিন্ন কৌশল এবং ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের মাত্রা। তাই বলা যায়, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ তাদের চেয়ে অধিক ক্ষমতাবানদের আগ্রাসনের শিকার হয় আবার তারা তাদের অধীনদের ওপর (যদি কেউ অবশিষ্ট থেকে থাকে) ক্ষমতা প্রয়োগ করে ক্ষমতার প্রসার ঘটায়।[১১] প্রাসঙ্গিকভাবে, জন-মানুষের যে ক্ষুদ্রাংশ সমাজ-অর্থনীতি ও রাজনীতির রসায়নকে কাজে লাগিয়ে কখনো কখনো ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে ওঠে, তারা আর শেষ পর্যন্ত জন-মানুষের কাতারে থাকে না – এ এক অমোঘ সমাজ-সত্য। সুতরাং, 'জন-মানুষ' অভিধাটিকে কার্যত সাব-অল্টার্ন, নিম্নবর্গ, প্রান্তিক গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরবর্তী প্রপঞ্চ (phenomenan) হিসেবে বিবেচনা করার সুযোগ থাকে না। এ কারণে বর্তমান প্রবন্ধে জনমানুষ বলতে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষমতাশূন্য মানুষকেই নির্দেশ করা হয়েছে।

ঢাকার জন-মানুষ ও তাদের ভাষা

ফুকোর ক্ষমতা-শৃঙ্খলের যে গঠন-কাঠামো এই উপমহাদেশীয় অঞ্চলগুলো উপনিবেশের উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে তা পাল্টে ফেলার প্রক্রিয়াটি এখনও ফলপ্রসূ হয়নি। রণজিৎ গুহের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সাব-অল্টার্ন স্টাডিজ গ্রুপের সূত্রে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে জন-মানুষ কেন্দ্রিক ইতিহাস-চর্চা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে।[১২] রণজিৎ গুহ নিম্নবর্গের মানুষের সংজ্ঞার্থ প্রদান করতে গিয়ে বলেন, দক্ষিণ এশীয় সমাজে শ্রেণি, বর্ণ, বয়স, জৈবিক লিঙ্গ এবং কর্মক্ষেত্র ও অন্যান্য সূত্রে অধীন মানুষের সমষ্টিকেই নিম্নবর্গ হিসেবে অভিহিত করেন।[১৩] তাঁর মতে, ভারতীয় জাতীয় ইতিহাস রচনা প্রভাবিত হয়েছে ঔপনিবেশিক এলিট বা জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া এলিট দ্বারা। আর এই উভয় শ্রেণির উদ্ভব ঘটেছে ইংরেজ ঔপনিবেশিকতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে। এমনকি, নগরায়ণের সূত্র ধরে এই সমাজের একটি শ্রেণিকে অধীন করার পাশাপাশি ঔপনিবেশিক ঘেরাটোপে 'নাগরিক' নামে যে সত্তাটি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তা-ই উপনিবেশ-উত্তর প্রেক্ষাপটে হয়ে উঠেছে ক্ষমতাধর 'এলিট'।[১৪] ফলে, নগরের জন-মানুষ আদৌ আর এলিটদের দৃষ্টিতে নাগরিক রইলো কি না তা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু এ কথাতো অস্বীকার করার উপায় থাকে না যে, এই জন-মানুষেরাই শ্রমের মধ্য দিয়ে নগরের ক্রমবিকাশ ঘটায়। তাই, সমাজের কর্তৃত্বহীন জন-মানুষ এলিটদের তৈরি করা ক্ষমতা-শৃঙ্খলে যতখানি ব্রাত্যই হোক না কেন, নিজেদের বিপুল সংখ্যার কারণেই তাদেরকে বাদ দিয়ে কোনো নগরের ইতিহাসকে পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রদান করা সম্ভব নয়। একইভাবে, এই কথা নগরের ভাষার গঠন-কাঠামো গড়ে ওঠার ক্ষেত্রেও সত্য। কেননা, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানবদলের ভাষাকে বাতিল করে দেওয়া সহজ নয়। তাই, জন-মানুষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের গভীরে রয়ে যায় তাদের ভাষিক বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন বৈশেষিক লক্ষণ। বিষয়টি নিয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। আপাতত মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন যে, জীবনের যে ইতিহাস আলোচিত হয়, তার বাইরেও ইতিহাস থেকে যায়।[১৫] এই জন্যই ঔপনিবেশিক ক্ষমতাতত্ত্বই হোক আর রাজতান্ত্রিক অথবা বর্তমান ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদী ইতিহাস রচনাই হোক– জন-মানুষের ইতিহাস ছাড়া তা অসম্পূর্ণ। কারণ 'তল থেকে দেখা' ইতিহাস অর্থাৎ সমাজ প্রতিষ্ঠার বিশাল ইমারতের তল থেকে খুঁজে খুঁজে তোলা বিস্মৃত ও অনালোচিত সংজ্ঞাপন চর্চার মধ্য দিয়েই পূর্ণাঙ্গভাবে উন্মোচিত হতে পারে কোনো সমাজের প্রকৃত ইতিহাস।[১৬]

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মুঘল যুগে ঢাকা নগর পত্তনের মধ্য দিয়ে ঢাকার ইতিহাস অন্যদিকে বাঁক নেয়। অর্থাৎ, রাজধানী হিসেবে ঘোষিত হওয়ার ফলে ঢাকাকে কেন্দ্র করে শাসক শ্রেণির বাস শুরু হয় এবং তাদেরকে ঘিরে গড়ে ওঠে ক্ষমতার বলয়। তখন এ নব্য-নগরায়ণের প্রতিক্রিয়ায় ঢাকায় একটি শ্রেণি ক্রমেই হয়ে ওঠে জন-মানুষ। প্রাক্-মুঘল যুগের এ অঞ্চলের অধিবাসীদের ও তাদের সামাজিক শ্রেণি বিন্যাস সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না। তবে মুঘল রাজধানী হিসেবে ঢাকার গড়ে ওঠার সময় শাসক শ্রেণির আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে একটি বিশেষ সামাজিক শ্রেণির বিকাশ লক্ষ করা যায়। এরা ঢাকার সুখবাসী বা খোশবাসী সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের বাইরে ঢাকার বিশাল নগরায়ণ প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে আর যে শ্রেণির সন্ধান মেলে তারা শ্রমজীবী সম্প্রদায়– ঢাকাই কুট্টি।

হাকিম হাবিবুর রহমান[১৭], সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুর[১৮]-সহ প্রমুখ ইতিহাসবেত্তার ভাষ্য অনুসারে, ঢাকার আদি অধিবাসীগণ দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত। এক শ্রেণি 'কুট্টি' হিসেবে পরিচিত; অন্য শ্রেণি

'সুখবাসী' কিংবা 'খোশবাসী' বা 'সুব্বাসী'। কুট্টিদের ভাষা 'ঢাকাইয়া বাংলা' আর সুখবাসীদের ভাষা 'ঢাকাইয়া উর্দু' (উর্দুভাষার ঢাকা-কেন্দ্রিক বৈচিত্র্য)। কুট্টিদের ঢাকায় আসা ও বসতি গড়ে তোলা বিষয়ে বিভিন্ন গবেষক যেসব তথ্য প্রদান করেছেন তাদের অধিকাংশের মত-ই এক; তা হলো – ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দের পরবর্তীকালে এবং মুঘলদের প্রয়োজনে কুট্টিরা ঢাকায় বসতি স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু করে। এছাড়াও ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষের ফলে নাসিরাবাদ (ময়মনসিংহ), কুমিল্লা, সুধারাম (নোয়াখালি), জালালপুর (ফরিদপুর) থেকে প্রচুর দরিদ্র লোক ঢাকায় আসে এবং বসতি স্থাপন করে। ঢাকা শহরের শাসন কর্তাদের খাজনা আদায়ে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ খাজনা হিসেবে প্রজাদের নিকট হতে যে ধান আদায় করতেন, এসব লোকেরা সেই ধান ঢেঁকিতে কুটে জীবিকা নির্বাহ করত। এর সূত্র ধরেই এ শ্রেণির লোকদের 'কুট্টি' বলা হতো। মূলত কুট্টিরাও ছিল ঢাকায় বহিরাগত (বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হতে অভিবাসনকারী)। কুট্টিরা ধান কোটা ছাড়াও নতুন জমিদারদের দালান তৈরির জন্য ইট-ভাঙা পেশায় নিয়োজিত ছিল। ধোলাইখালের উভয় তীর, কলতাবাজার, রায়সাহেবের বাজার, সোয়ারিঘাট, সুরিটোলা, সূত্রাপুর, বংশাল প্রভৃতি এলাকায় কুট্টিদের বাস। কুট্টিরা ছিল খাস বাঙালি, আরও স্পষ্টভাবে বললে, বাংলাভাষী। কুট্টিদের অধিকাংশ ছিল নিরক্ষর ও দরিদ্র। কিন্তু ঢাকায় তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল।[১৯] এই কুট্টিরা শুধু ধান কোটা নয়, উনিশ শতকের শেষের দিকে ঢাকা শহরের চালের খুচরা বাজার নিজেদের দখলে আনতে সক্ষম হয়।[২০] চালের ব্যবসায় ছাড়াও কুট্টিরা শহরে বিভিন্ন ধরনের পেশাকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করে। ১৮৩৮ সালে লোক গণনার সময় ঢাকা শহরের অধিবাসীদের পেশাভিত্তিক তালিকা করা হয়। তাতে ১৩৮ ধরনের পেশাজীবীদের মধ্যে কুট্টিদের সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্য।[২১] কুট্টি ছাড়াও তখন ঢাকায় সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত অপর শ্রেণিটি হলো সুখবাস সম্প্রদায়। এরা বহির্বাংলা থেকে ঢাকায় আগমনকারী অভিবাসীদের বংশধর। মুঘল আমলে প্রশাসনিক, সামরিক ও বাণিজ্যিকসহ বিভিন্ন কারণে এরা ভারতের আগ্রা, দিল্লিসহ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে ঢাকায় বসতি স্থাপন করে। সুখবাসরা ছিল তৎকালীন ঢাকা শহরের অভিজাত সম্প্রদায়। তারা একদিকে ছিল শিক্ষিত, ধনী, শৌখিন; অন্যদিকে তাদের অনেকেই ঢাকায় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। হাকিম হাবিবুর রহমান রচিত *আসূদেগানে ঢাকা* গ্রন্থে সুখবাস সম্প্রদায় সর্ম্পকে জানা যায় যে খোশবাস বা সুখবাস বা সুব্বাসী, ঢাকায় বাসকারী সেইসব লোক যারা মুঘল সুবেদারদের সঙ্গে এখানে আগমন করেন।[২২] সুব্বাসীরা অল্পায়াসে জীবন ধারণোপযোগী ছোটখাট পেশায় নিয়োজিত থাকতেন। আর নীলিমা ইব্রাহিমের ভাষ্যমতে, কুট্টিরা সুব্বাসীদের বলেন, 'বাজাইরা'।[২৩] চকবাজার, বেগমবাজার, উর্দুবাজার, ইত্যাদি বাজার এলাকায় সুব্বাসীদের বাস ছিল বলে তাদের বাজাইরা বলা হতো।

এই দুই সম্প্রদায়ের জীবন-কাঠামো পর্যালোচনা করে বলা যায়, ঢাকায় সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে কুট্টিরা ছিল প্রত্যক্ষভাবে শাসিত সম্প্রদায় আর সুখবাসীরা ছিল শাসক কিংবা শাসকদের আনুকূল্যপ্রাপ্ত। তাই বলা চলে যে, কুট্টিরাই এই গবেষণার আলোচ্য জন-মানুষ। একাধিক গবেষক[২৪] এই কুট্টি সম্প্রদায়কে নগর ঢাকার প্রান্তিক মানুষ বা সাব-অল্টার্ন হিসেবে অভিহিত করেছেন।[২৫] কারণ কুট্টিদের সামাজিক অবস্থান ছিল সুখবাসদের নিচে। আর সমাজে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার প্রশ্নে তারা ছিল বরাবরই বঞ্চিত, অপাঙ্‌ক্তেয়। এই সমাজিক-অর্থনৈতিক স্তরবিন্যাসও ঢাকাই ভাষাকে প্রভাবিত করেছে বিভিন্ন দিক থেকে যা এই ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বিবেচনার জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ঢাকাই ভাষা

পুরনো ঢাকার কুট্টিদের ভাষা মূলত বাংলা নির্ভর ফারসি এবং হিন্দুস্তানি ভাষার মিশ্রণে সৃষ্ট উপভাষা (Dialect)। এই ভাষারীতিটি এক ধরনের বাংলা 'জার্গন', যা তৎকালীন প্রচলিত ঢাকার ভাষার তুলনায় ভিন্নতর। সুখবাস সম্প্রদায় এই কুট্টি ভাষাকে সবসময় হেয় জ্ঞান করত এবং কুট্টি ভাষা তাদের জন্য হাসির খোরাক ছিল।[২৬] এর কারণ যে নিতান্তই আধিপত্যবাদী মানসিকতা প্রসূত তা অনুধাবন করা কষ্টসাধ্য নয়। মনিরুজ্জামান ঢাকাই ভাষার তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। ১) এটি একটি মিশ্র ভাষা, ২) এটা ঢাকার অভ্যন্তরে ব্যবহৃত ও সুরক্ষিত গোত্রভিত্তিক ভাষা বৈশিষ্ট্য, এবং ৩) এটা নিতান্তই পুরনো মহল্লাবাসীদের নিজেদের আত্মসংযোগের জন্য তথা আত্মপরিচয়ের প্রয়োজনে ব্যবহৃত ভাষা।[২৭] ঢাকাই ভাষা নিঃসন্দেহে একটি মিশ্র ভাষা। এ ভাষা শুধু ঢাকার অভ্যন্তরে ব্যবহৃত হয় একথা যেমন সত্য তেমনি ঢাকার পাশ্ববর্তী অঞ্চলে ব্যবহৃত উপভাষার সঙ্গে এর গভীর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ঢাকাই ভাষা ঢাকার জন-মানুষের আত্মপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার প্রারম্ভিক নগরায়ণের দৃশ্যপট উন্মোচনেও ভূমিকা পালন করে। প্রসঙ্গত, এই তথাকথিত ঢাকার জন-মানুষ ব্যবহৃত জার্গনের সঙ্গে বিক্রমপুর অঞ্চলের ভাষার তুলনামূলক ভাষাবৈজ্ঞানিক আলোচনার মধ্য দিয়ে বর্তমান গবেষণায় ঢাকার নগরায়ণ ও ঢাকাই ভাষার পারস্পারিকতা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বস্তুত, বর্তমান গবেষণায় মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত উপাত্তের সাহায্যে ঢাকাই ভাষার ও বিক্রমপুরের ভাষার ভাষাগত সাদৃশ্যের ভিত্তিতে ঢাকার নগরায়ণ বিকাশে শাসক শ্রেণির সঙ্গে সঙ্গে জন-মানুষের যে অবস্থান রয়েছে তা সুচিহ্নিত করা হয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বিক্রমপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলের উপভাষাসমূহ বিশেষভাবে ঢাকার সমীপবর্তী। এদের প্রত্যেকের সঙ্গেই কুট্টি ভাষার সাযুজ্য সন্ধান করে দেখা প্রয়োজন। তবে, বর্তমান প্রবন্ধে পরিসরগত সীমাবদ্ধতার কারণে নমুনা হিসেবে কেবল বিক্রমপুরের উপভাষাকে গ্রহণ করা হয়েছে এবং এ ভাষা-বৈশিষ্ট্যকে ঢাকাই ভাষার বিশেষ রূপের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে, উইলিয়াম স্যামারিন প্রণীত শব্দসূচি থেকে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত হয় এমন নির্বাচিত শব্দগুচ্ছের একটি তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।[২৮] এই শব্দ তালিকা উপভাষাসহ যে কোনো ভাষার সংরক্ষণের জন্য সর্বস্বীকৃত ও বহুল ব্যবহৃত একটি উপাত্ত সংগ্রহ কৌশল। এই তালিকা ব্যবহার করে পুরনো ঢাকার অধিবাসী একজন নারীর (বয়স-৪২) কাছ থেকে তালিকাভুক্ত শব্দসমূহের কুট্টি ভাষিক রূপ সংগ্রহ করা হয়েছে। ওই একই শব্দতালিকা ব্যবহার করে বিক্রমপুরের স্থায়ী অধিবাসী একজন নারীর (বয়স-৫৫) কাছ থেকে বিক্রমপুরের ঔপভাষিক রূপসমূহ সংগ্রহ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, তথ্যদাতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে অধিক বয়সী নারীদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কেননা, বয়সের আধিক্যের কারণে তাদের ভাষায় সংশ্লিষ্ট ভাষা দুটির অপেক্ষাকৃত অমিশ্র রূপ পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি ছিল। একইসঙ্গে, নারী হওয়ার কারণে বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে তাদের সামাজিক গতিশীলতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় তাদের ভাষায় অন্য ভাষার প্রভাব স্বল্প থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। শব্দরূপ সংগ্রহের পাশাপাশি উল্লিখিত তথ্যদাতাদের কাছ থেকে দুটি প্রচলিত লোকগল্পের কুট্টিভাষিক রূপ এবং বিক্রমপুরের ঔপভাষিক রূপ সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া, ঢাকাই কুট্টি ভাষা ও বিক্রমপুরের উপভাষার ধ্বনিস্তরের তুলনার জন্য পূর্ববর্তী বিভিন্ন গবেষণার সহায়তা নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক উৎস থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত ব্যবহার করে কুট্টি ভাষার সঙ্গে বিক্রমপুরের উপভাষার তুলনা করে দেখা

হয়েছে। সবশেষে বিক্রমপুর ও ঢাকা অঞ্চলের বহুল প্রচলিত কিছু প্রবাদ উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে এই দুই ভাষারূপের তুলনামূলক আলোচনাকে ঋদ্ধ করা হয়েছে।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

কুট্টি ভাষায় কিছু ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা বাংলা ভাষার অন্যান্য উপভাষায় নেই বললেই চলে। যেমন /চ/ (/প/) ধ্বনির ঘৃষ্ট উচ্চারণ (/ঃʃ/)। ধারণা করা হয় যে, নগরায়ণের প্রভাবে আর সুখবাস ভাষার সংস্পর্শে এসে এবং নিজস্ব উচ্চারণ কৌশল বিকৃত হয়ে এরূপ উচ্চারণ রীতি প্রকাশ পেয়েছে। পূর্বে অনেক শোনা গেলেও বর্তমানে এই রীতি হ্রাস পাচ্ছে। অনেকেই /চ/ ধ্বনির এই ঘৃষ্ট উচ্চারণ সচেতনভাবে এড়িয়ে চলেন।[২৯] উল্লেখ্য যে, এই বৈশিষ্ট্যটি বিক্রমপুরের উপভাষায় দেখা যায় না। ঢাকাই ভাষার ধ্বনি বৈশিষ্ট্য[৩০] এবং বিক্রমপুরের ভাষার ধ্বনি বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক আলোচনা নিচে উপস্থাপন করা হলো:

১। কুট্টি ভাষার মতো বিক্রমপুরের ভাষায়ও আনুনাসিক স্বর ধ্বনির ব্যবহার নেই বললেই চলে। উদাহরণস্বরূপ কাঁদা>কান্দা, চাঁদা>চান্দা ইত্যাদি।

২। বিক্রমপুরের উপভাষার মতো কুট্টি ভাষায়ও /এ/ ধ্বনিটি কখনো কখনো /অ/ ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন: এখন>অখন/ অহন, এখনো>অখনো/ অহনো ইত্যাদি।

৩। বিক্রমপুরের উপভাষার মতো কুট্টি ভাষায়ও ভবিষ্যৎ নির্দেশক ক্রিয়াপদের শেষে একটি বাড়তি /উ/ ধ্বনি কখনো কখনো যুক্ত হয়। যেমন: যাব>যামু, খাব>খামু ইত্যাদি।

৪। শব্দের অদ্য অবস্থানে 'শ' এর 'হ' উচ্চারণ শোনা যায়। শালা>হালা, শোল>হোল। আবার তালব্য দন্ত্যমূলীয় /শ/ (/ʃ/) এর পরিবর্তে ইংরেজি /ং/ এর অনুরূপ দন্ত্য /স/ এর উচ্চারণ কুট্টি ভাষায় ব্যাপক।

৫। কুট্টি ভাষায় ও বিক্রমপুরের উপভাষায় জিহ্বামূলীয় ধ্বনি (যেমন: /ক/, /খ/) কখনো কখনো কণ্ঠনালীয় /হ/ ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন: টাকা>ট্যাকা/ট্যাহা

৬। কুট্টি ভাষায় ও বিক্রমপুরের উপভাষায় তাড়নজাত ধ্বনিগুলো (যেমন: /ড়/, /ঢ়/) পরিবর্তিত হয়ে কম্পনজাত /র/ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন, রাঢ়>রার, গাঢ়>গার, গাড়ি>গারি, শাড়ি>শারি, মাড়ি>মারি ইত্যাদি।

৭। দুই স্বরের মধ্যবর্তী অঘোষ ধ্বনি (যেমন: / ট/, /ঠ/) ঘোষ ধ্বনিতে (যেমন: /ড/) তে পরিণত হয়। যেমন- ব্যাটা-> ব্যাডা ইত্যাদি।

৮। মহাপ্রাণ ধ্বনি লোপ পেয়ে কখনো কখনো অল্পপ্রাণ হয়ে যায়। যেমন: ভাত>বাত, বাঘ>বাগ ইত্যাদি।

বিক্রমপুরের ভাষার সঙ্গে ঢাকাই কুট্টি ভাষার এই ধ্বনিগত সাদৃশ্য মূলত বিক্রমপুর অঞ্চলের জন-মানুষের ঢাকামুখী নগরায়ণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ইতিহাসকে তুলে ধরে। সঙ্গত কারণেই ভাষার ধ্বনিস্তরে সবচেয়ে কম ঋণকরণ হয়ে থাকে। সেই দিকে থেকে বিবেচনা করে বলা যায় যে, বিক্রমপুরের ভাষা থেকে ঋণকরণের মাধ্যমে উল্লিখিত ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ঢাকাই ভাষায় আসেনি বলেই প্রতীয়মান হয়। বরং, বিক্রমপুর অঞ্চলের খেটে খাওয়া জন-মানুষের যে বিরাট দল ঢাকার নগরায়ণ প্রক্রিয়ায় বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল তারই ভাষিক প্রমাণ হিসেবে এই বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশেষভাবে কার্যকর।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

ভাষায় রূপতাত্ত্বিক উপাদানসমূহ সংশ্লিষ্ট ভাষার ব্যবহার প্রকৃতি বিশ্লেষণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমান আলোচনায় স্যামারিনের[৩১] শব্দ তালিকা অনুসরণ করে শব্দসমূহের কুট্টি

ভাষার রূপ এবং বিক্রমপুরের উপভাষার রূপ বিষয়ক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। নিচে প্রমিত বাংলাসহ কুট্টি ভাষা আর বিক্রমপুরের উপভাষা থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত উপস্থাপন করা হলো:

স্যামারিনের শব্দতালিকা	*প্রমিত বাংলা*	*ঢাকাই ভাষা*	*বিক্রমপুরের উপভাষা*
Back	পশ্চাৎ/ পেছন	পিছন	পিছন
Fight	যুদ্ধ	জগরা/মারামারি/গ্যাঞ্জাম	এারামারি
Heart	হৃদয়	দিল/ মন	এন
Leg	ঈা	পাও	পাও
Mouth	মুখ	মুখ	মুখ
Narrow	গরু	চিপা	চিকন
Night	রাত	রাইত	রাত্র
Rope	দড়ি	রস্সি	ওশি
Because	সুতরাং	কিন্তু	তাইলে
Person	ব্যক্তি	ব্যাটা/ ব্যাটি	ব্যাটা
Old	উয়স	বয়স	উয়স
Sea	সমুদ্র/ সাগর	সমুদ্দুর	সমুদ্র
Cook	ওান্না	রান্দা/ পাক করা	রান্ধন/ পাক করা
Woman	ইারী	বেটি/ জেনানা	মাইয়া/ মাইয়া লোক
Man	ঈুরুষ	ব্যাটা	ব্যাটা/ ব্যাটাছেলে
Sharp	তীক্ষ্ণ	চোক্খা/ ধারাইল্লা	আর
Small	ছোট	ছোডো	ছোট/ কুট্টি
Stone	পাথর	পাত্থর	পাথর
Thick	প্রশস্ত	চওড়া/ মোটা	মোটা
Thin	পাতলা	পাতলা/ চিকনা	পাতলা/ চিকন
Count	গণনা	গুনা	গনা
Die	মৃত্যু	মোরছে	মইরা গ্যাছে
Dirty	এয়লা	ময়লা/ কুড়া	ময়লা

সারণি ১: কুট্টি ভাষা ও বিক্রমপুরের ভাষায় প্রাপ্ত রূপতাত্ত্বিক উপাত্ত

ওপরে যে শব্দগুলো নেয়া হয়েছে তার বেশিরভাগই প্রাত্যহিক ব্যবহৃত হয় বিধায় এদের ঋণকৃত হওয়ার সম্ভাবনা কম। ব্যবহারিক প্রতিবেশে এই শব্দগুলোর উচ্চারণ বা ব্যবহারে কিছুটা রকম-ফের পরিলক্ষিত হলেও মূলত এই শব্দগুলোর অভ্যন্তরীণ সাদৃশ্য বিবেচনা করা প্রয়োজন। এরূপ শব্দই সন্ধান দিতে পারে নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়ের সূত্রের। একই উৎস থেকে উৎসারিত ভাষা দীর্ঘদিন আলাদা প্রতিবেশে ভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু কিছু শব্দে বা শব্দের পরিবর্তনের মধ্যেও ভাষার উৎসগত বৈশিষ্ট্য রয়ে যায়। এই বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করেই ভাষীদের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্কের অধ্যয়ন সম্ভব। এখানে পরিসরগত সীমাবদ্ধতার কারণে সীমিত কিছু শব্দের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ দেখানো হলো। এই বিশ্লেষণ আরও বেশি শব্দের মধ্যে আরও বৃহৎ পরিসরে দেখানো সম্ভব; যত বেশি শব্দের মধ্যে এই মিল পাওয়া যাবে তত বেশি ভাষাগত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়টিকে আরও বেশি প্রতীয়মান করে তুলবে।

ডিসকোর্স বিশ্লেষণ

ডিসকোর্স মূলত একটি ভাষার ব্যবহারগত তথা এর প্রায়োগিক বিশেষত্বকে নির্দেশ করে। জন-মানুষের ভাষার ডিসকোর্স বৈশিষ্ট্য কীরূপ তা এ আলোচনার লক্ষ্য নয়। বর্তমান আলোচনায় ডিসকোর্সের প্রসঙ্গ মূলত তুলনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা হয়েছে। নিচের উপস্থাপিত নমুনাগুলো থেকে দেখা যাবে যে, ঢাকাই কুট্টি ভাষার ডিসকোর্স কাঠামোর সঙ্গে বিক্রমপুরে ব্যবহৃত ডিসকোর্স কাঠামোর বিশেষ সাদৃশ্য বিদ্যমান। এই সাদৃশ্যের কারণও প্রমাণ করে যে, বিক্রমপুরের উপভাষার ভাষিক কাঠামোর প্রভাব ঢাকাই কুট্টি ভাষায় বিশেষভাবে উপলব্ধ। নিচে এরূপ দুই সেট নমুনা উপস্থাপন করা হলো। উল্লেখ্য যে, গল্পটি রাজীব হুমায়ুনের গবেষণা প্রবন্ধে ব্যবহৃত হয়েছিল।[৩২] তবে বর্তমান প্রবন্ধে মাঠ পর্যায় থেকে নতুন করে গল্প-সংশ্লিষ্ট উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। লক্ষণীয় যে, বর্তমানের সংগৃহীত উপাত্তের সঙ্গে রাজীব হুমায়ুনের সংগৃহীত রূপটির কিছু ক্ষেত্রে পার্থক্য বিদ্যমান।

নমুনা: ০১

কুট্টিভাষা ও বিক্রমপুরের উপভাষার সাদৃশ্য আরো স্পষ্ট করে দেখানোর জন্য একটি সুপরিচিত লোককাহিনি টোনাটুনির গল্প নির্বাচন করে এর কুট্টিভাষার রূপের সঙ্গে মাঠ পর্যায় থেকে সংগ্রহকৃত বিক্রমপুরের উপভাষার রূপের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

কুট্টি ভাষা:

টোনা ডাইকা টুনিরে কয়, আমার যে পিঠা খাইবার মন চাইছে না। টুনি কইল, চাইল আনগা, চালনি আনগা, কি দিয়া পিঠা তৈয়ার করুম? টোনা ঘাটে গিয়া বোয়া রইছে। দেহে পাইলার নাও যাইতাছে। কয়, পাইলা অলা ভাই, পাইলা দিয়া যাও। - যা ব্যাটা বনিবাটা করি নাই, পাইলা দিমু ক্যালা? টোনা কয়, আল্লায় জিমুন করে, নাও ডুইবা যায়। এলা নাও গাঙে ডুইবা গেছে। হাতুইরা-পাতুইরা পাইলা দিয়া বাড়িঘর ভইরা ফালাইছে। কয়, ল তরা কত পাইলা লবি। তারপর কাহেল অলার কাছে গেছে। কয় কাহেল অলা ভাই, কাহেল দিয়া যাও। - যা ব্যাটা, বনি করি নাই, বাট্টা করি নাই, অহন আইছে চাইবার। কয়, আল্লায় জিমুন করে মাইজ গাঙে কাইত অয়া যায়গা। এলা হাতুইরা পাতুইরা কাহেল আইনা বাড়িঘর ভইরা ফালাইছে। টুনি কয়, গুড়ি কুটুম কি দিয়া? চাইল কই? কয়, চাইল অলা ভাই, চাইল দিয়া যাও, আমরা পিঠা বানামু। এলা কয় কি, লাকড়ি আনগা। জঙ্গলে লাকড়ি ভাঙবার গেছে। বাঘে কয়, ক্যাঠারে ভাই, কি করছস? টোনা কয়, পিঠা বানামু। বাঘেভি গাছে চইড়া লাকড়ি ভাইঙা দ্যায়। কয়, আমারে পিঠার ভাগ দিবি। কয়, - হ দিমু।

বিক্রমপুরের ভাষা:

টোনা ডাইক্যা টুনিরে কয়, আমার যে পিঠা খাইতে মন চাইত্যাছে। টুনি কোইল, চাউল আনগা, চালনি আনগা, কি দিয়া পিঠা বানামু? টোনা ঘাটে গিয়া বইয়া রইছে। দেখে ডেচকি-পাতিলের (বিকল্প: পাইলার) নৌকা যাইতাছে। কয়, পাইলা/ডেচকিআলা ভাই, ডেচকি/ পাইলা দিয়া যাও। - যা ব্যাটা, বনি করি নাই, বাট্টা করি নাই, অখন আইছে চাইতে। কয়, আল্লায় যদি চায় তবে নৌকা ডুইব্বা যায়। এবার নদীর মইদ্যে নৌকা ডুইব্বা গ্যাছে। অ্যাক অ্যাক কইর‍্যা আতাইয়া আতাইয়া পাতিল আইনা বাড়িঘর ভইরা ফালাইছে। কয়, নে তরা কত পাইলা/ ডেচকি নিবি। হেরপর কাহিলআলার সামনে যায়। গিয়া কয়,কাহিলআলা ভাই, কাহিল দিয়া যাও। - যা ব্যাটা,

বনি করি নাই, বাট্টা করি নাই, অখন আইছে চাইতে। আল্লায় যদি চায় তবে নদীর মইদ্যে নৌকা কাইত ওইয়্যা যাইবো। অ্যাক অ্যাক কইর‍্যা আতাইয়া আতাইয়া কাহিল আইনা বাড়িঘর ভইরা ফালাইছে। তারপর টুনি আবার কয়, গুড়ি কুটুম ক্যামনে? চাউল কই? কয় চাউলআলা, চাউল দিয়া যাও, আমরা পিঠা বানামু। অখন লাকড়ি আন তো। জঙ্গলে লাকড়ি ভাঙ্গতে গ্যাছে। বাগে কয়, ক্যাডারে ভাই, কি করছো? টোনা কয়, পিঠা বানামু। বাগে গাছে উইঠ্যা লাকরি ভাইঙ্গা দ্যায়। কয়, আমারে পিঠার বাগ দিবি। কয়, - হ দিমু।

নমুনা : ০২

ঢাকাই কুট্টি ভাষা এবং বিক্রমপুরের উপভাষার মধ্যকার ডিসকোর্সগত সাদৃশ্য উপস্থাপনের জন্য মাঠ পর্যায় থেকে গৃহীত আরেকটি সুপরিচিত উপদেশমূলক গল্প 'বিপদের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু' উপাত্ত হিসেবে উপস্থাপন করা হলো।

কুট্টি ভাষা

দুই বন্ধু জঙ্গলের মইধ্য দিয়া যাইতাছিল। এমন সময় দূর থিকা একটা ভাল্লুক আইতাছিল। অগো মইধ্যে এক বন্ধু গাছে উঠবার পারত। হেই বন্ধু ভাল্লুক দেইখ্যা ডরে তাড়াতাড়ি গাছে উঠ্যা গেছে। কিন্তু আরেকজন তো গাছে উঠবার পারে না। এলা কি করবো। এমন সময় হেয় একটা বুদ্ধি করল। হেয় মরার মত কইর‍্যা মাটিতে শুইয়্যা পরলো। কিছুকক্ষণ পরে ভাল্লুক হের কাছে আইলো। ভাল্লুক সামনে আইয়্যা দ্যাখে মানুষটা লরেচরে না। ভাল্লুক ভাবছে মরা মানুষ। একটু হুইঙ্গা ভাল্লুক গ্যাছে গা। ভাল্লুক যাইবার পর যে বন্ধু গাছে আছিলো হেয় নাইম্যা আইয়া কয়, বন্ধু ভাল্লুক তোমারে কানে কানে কী কইল? তহন ঐ বন্ধু কয়, ভাল্লুক আমারে কইল বিপদের বন্ধুই সাচ্চা বন্ধু।

বিক্রমপুরের ভাষা

দুই বন্ধু জঙ্গলের মইধ্য দিয়া যাইতাছিল। এমন সময় দূর থিকা একটা ভাল্লুক আইতাছিল। অগো মইধ্যে এক বন্ধু গাছে উঠতে পারত। হেই বন্ধু ভাল্লুক দেইখ্যা ডরে তাড়াতাড়ি গাছে উইঠ্যা গ্যাছে। কিন্তু আরেকজন তো গাছে উঠতে পারে না। অখন হেয় কি করবো। এমন সময় হেয় একটা বুদ্ধি বাইর করল। হেয় মরার মত কইর‍্যা মাটিতে শুইয়্যা পরলো। কতকক্ষণ পরে ভাল্লুক হের কাছে আইল। হের পর ভাল্লুক সামনে আইয়্যা দ্যাখে মানুষটা লরেচরে না। ভাল্লুক ভাবছে মরা মানুষ। একটু হুইঙ্গা/শুইঙ্গা ভাল্লুক গ্যাছে গা। ভাল্লুক যাওনের পর যে বন্ধু গাছে আছিলো হেয় নাইম্যা আইয়া কয়, বন্ধু ভাল্লুক তোমার কানে কানে কী কইল? তহন ঐ বন্ধু কয়, ভাল্লুক আমারে কইল বিপদের বন্ধুই আসল বন্ধু।

ওপরের নমুনা দুটিতে দেখা যাচ্ছে যে, বিক্রমপুরের উপভাষার সঙ্গে কুট্টি ভাষার বাচনভঙ্গিগত মিল থাকলেও কিছু ভাষিক বৈসাদৃশ্যও রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কুট্টি ভাষায় /ং/ এর উচ্চারণ রয়েছে যা, বিক্রমপুরের ভাষায় অনেক কম পরিলক্ষিত হয়। কুট্টি ভাষায় /ছ/-এর উচ্চারণ ঘৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনির (affricate consonant) মতো, যেখানে বিক্রমপুরের উপভাষায় তা তালব্য ঘর্ষণজাত ব্যঞ্জনধ্বনির (palatal fricative consonant) মতো। ক্রিয়ার রূপভেদ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, কুট্টি ভাষাতে যেখানে খাইবার, ভাঙ্গবার ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে বিক্রমপুরের ভাষায়

খাইতে, ভাঙ্গতে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ কুট্টি ভাষায় প্রায়শই মূল ক্রিয়ার সাথে অসমাপিকা নির্দেশক '-বার' শব্দটি যুক্ত হতে দেখা যায়, যা বিক্রমপুরের উপভাষায় প্রমিত ভাষারূপ সদৃশ। আবার হিন্দুস্থানি ভাষার প্রভাবে কুট্টি ভাষায় কিছু সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহার যেমন 'বাঘেভি' শব্দের 'ভি'-র প্রয়োগ হয়ে থাকে যা বিক্রমপুরের ভাষায় দেখা যায় না। কুট্টি ভাষার এইসব ভাষিক উপাদান থাকার কারণ হিসেবে নগরায়ণ এবং সুখবাসী ভাষার প্রভাবকে বিবেচনা করা যেতে পারে। তাছাড়া পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ভাষা প্রতিবেশ অনুসারে ভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়। বলা যায় যে, বৃহত্তর পরিসরে, আরও বেশি তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হলে এই দুই ভাষা রীতির মেলবন্ধন স্থাপন করা আরও সহজ হবে।

প্রবাদ-প্রবচন

দুটো ভাষার ভাষাগত তুলনামূলক আলোচনায় প্রবাদ-প্রবচন গুরুত্বের সঙ্গে বিশ্লেষিত হয়। প্রবাদ-প্রবচন সাধারণত কোনো অঞ্চলের বাস্তব নির্ভর উপাদানের আলোকে প্রচলিত হয়ে থাকে। তাই জীবন ও সংস্কৃতির সন্ধান পাওয়া যায় আঞ্চলিক প্রবাদসমূহে। এই কারণে নিচের সারণিতে ঢাকাই ভাষায় প্রাপ্ত কিছু নির্বাচিত প্রবাদ-প্রবচন[৩৩] ও বিক্রমপুর অঞ্চলে ব্যবহৃত কিছু নির্বাচিত প্রবাদ-প্রবচন[৩৪] উপস্থাপন করা হলো।

ঢাকাই প্রবাদ	বিক্রমপুরের প্রবাদ
য্যায়সে করনি, ওয়্যাসে ভরনি	যেমন কর্ম, তেমন ফল
বান্দরের পেটে ঘি হজম হয় না	কুত্তার প্যাটে ঘি অজম হয় না
বইবার দিলে হুইবার চায়	বইতে দিলে শুইতে চায়
আম দুধ মিল গিয়া গুটলি বাগানমে	আমে দুধে মিল্লা যায়, ছিটালের আঠি ছিটালে যায়
ঘরকা মুরগি, ডাল বরাবর	বাড়ির মুরগি ডাইলের মতো
ঘোড়াকা ঘাস কী সাথ দোস্তি	বাড়ির গরু আইতালের ঘাস খায় না
ধোবী কা কুত্তা, না ঘর কা না ঘাট কা	ধোপার কুত্তা না ঘরের না ঘাটের
মন চাঙ্গা তো কাটুরা মে গঙ্গা	আদিখ্লিলা নাপতের ঝি, পান্তা ভাতে ঢালে ঘি
আ-বাঙালে ঘোড়ায় চড়ছে, ঝাকি খায়া গাড়ায় পড়ছে	যেই দেশে যে বাও, উবুত হইয়া নৌকা বাও
বাপে চড়ায় ভেরি, পোলা লাগায় হাত ঘড়ি	যেমন গাছ তেমন গোটা, যেমন বাপ তেমন বেটা

সারণি ২: পুরনো ঢাকা ও বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচন

বিক্রমপুর ও ঢাকা অঞ্চলের প্রবাদ-প্রবচনে বিভিন্ন বিষয়গত ও ভাষাগত ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। তবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হলো একই প্রবাদের উপাদানগত ভিন্নতা। ঢাকাই অঞ্চল ও বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচনে তাদের প্রাত্যহিক ব্যবহৃত শব্দসমূহ স্থান পেয়েছে; যা একান্তভাবে তাদের বাস্তব জগৎকে চিত্রায়িত করে। আবার ঢাকাই ভাষার প্রবাদসমূহ সুখবাসী ভাষা প্রভাবিত কিছু উর্দু শব্দ ও প্রত্যয়ের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় যা বিক্রমপুরের ভাষায় স্বাভাবিকভাবেই অনুপস্থিত।

ভাষাগত এ সকল সাদৃশ্যের সাহায্যে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে, দীর্ঘকাল ধরে বিক্রমপুর থেকে ঢাকামুখী যে অভিবাসন ঘটেছে তার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে ঢাকার জন-মানুষের ভাষায়। বিক্রমপুরের উপভাষার সঙ্গে কুট্টিভাষার উচ্চারণ কিংবা প্রয়োগতাত্ত্বিক কিছু ভিন্নতা অনুধাবন করা

কষ্টসাধ্য না হলেও এ কথা বলা যায় যে, রূপতাত্ত্বিক স্তরে এই দুই ভাষার ব্যাপক সাদৃশ্য রয়েছে। এই সাদৃশ্য ঢাকার জন-মানুষের নৃতাত্ত্বিক বিশেষত্বকে সকলের সামনে তুলে ধরতে সহায়তা করে। লক্ষণীয় যে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে অমিল থাকা সত্ত্বেও তাই এ কথা অনস্বীকার্য যে, বিক্রমপুরের উপভাষার সঙ্গে কুট্টি ভাষার সাদৃশ্যই বেশি। ভাষার এই সদৃশতা জানিয়ে দেয়, ঢাকার নগরায়ণের প্রারম্ভিক সময়ে যে বিপুল জনগোষ্ঠীর ঢাকায় স্থানান্তর ঘটেছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ বিক্রমপুরের অধিবাসী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ঢাকার নগরায়ণে যে অগণ্য জন-মানুষের ভূমিকা রয়েছে তাদের মধ্যে এক বিরাট অংশের যোগ ছিল বিক্রমপুরের সঙ্গে। কিন্তু ঢাকার ইতিহাস চর্চায় শাসক শ্রেণি যে পরিমাণ গুরুত্ব পেয়েছে তার তুলনায় এই জন-মানুষের অবদান অনালোচিতই থেকে গেছে। কারণ ইতিহাস রচনা বরাবরই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এলিট শ্রেণির দ্বারা।[৩৫] বিক্রমপুরের ভাষা, সেইসূত্রে সংস্কৃতি এবং আরও অনেক কিছু হয়তো তারা যোগ করেছিল এই নগর নির্মাণে, যার প্রমাণ আজ ক্ষমতাবানদের উন্নাসিকতায় বিলুপ্ত। তবে অনুমান করা কষ্টসাধ্য নয়, ঢাকার অন্যান্য পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ঔপভাষিক রূপের সঙ্গেও ঢাকাই কুট্টি ভাষার সম্পর্ক বিদ্যমান। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই ধরনের সাদৃশ্য কেবল জন-মানবদলের সূত্রেই শনাক্ত করা সম্ভব। কেননা, এই শ্রেণির বিপরীতে ক্ষমতাধর এলিট শ্রেণিভুক্ত মানুষেরা সংখ্যায় বরাবর স্বল্প হয়; [৩৬] কেবল ক্ষমতা-শৃঙ্খলের নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে থাকায় তাদের ভাষাও নগরায়ণের ইতিহাস গড়তে ভূমিকা রাখে। কিন্তু সেই ইতিহাস তাদের আধিপত্যবাদী অবস্থানকেই প্রকারান্তরে প্রকটিত করে। অপরদিকে, জন-মানুষের ভাষা বিশ্লেষণের সূত্রে ঢাকার নগরায়ণের যে ইতিহাস অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পরিসরে বর্তমান আলোচনায় উঠে এসেছে তা মূলত এই নগরের ইতিহাস অন্বেষণের উদ্যোগকে শেকড়সন্ধানী করে তোলবে। যা ভবিষ্যতে আরও বৃহৎ গবেষণার প্রভাবক হিসেবে কাজ করবে। কারণ জন-মানুষ শুধু কথাহীন-ই নয়[৩৭] বরং তারা বললেও তাদের কণ্ঠস্বর ক্ষমতাবানদের শ্রুতিগ্রাহ্য নয়।[৩৮]

উপসংহার

সুতরাং, ঢাকার এই জন-মানুষেরা কীভাবে কোথা থেকে এই নগরের অধিবাসী হয়ে উঠল, কেমন ছিল তাদের জীবন-কাঠামো; এসব জানতে ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক বলে বিবেচিত হতে পারে। ঢাকাই কুট্টি ভাষার শব্দ, ডিসকোর্স প্রভৃতি হয়ে উঠতে পারে এই নগরের সাধারণ মানুষের সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস সন্ধানের চাবি-উপাদান। ভাষাই জানিয়ে যেতে পারে রাজ-রাজড়ার চোখ ধাঁধানো রাজকীয় ইতিহাস-ই শেষ কথা নয়, বরং আসল ইতিহাস রয়েছে জন-মানুষের কাছে; তাদের ভাষায়, প্রতিদিনের সংজ্ঞাপনে। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে 'নালবান' (ঘোড়ার খুরে নাল লাগানোর কারিগর), 'নেহানি' (বিয়ের গান পরিবেশনে নিয়োজিত ব্যক্তি), 'লৌকি' (মহররমের সময় বানানো কাঠ, বাঁশ, রঙিন কাপড়, কাগজের ঝালর দিয়ে তৈরি একধরনের ঝাড় বাতি) 'আড়গাড়া' (আস্তাবল) বিভিন্ন শব্দের কথা।[৩৯] এগুলোর মধ্য দিয়ে দ্যোতিত হয় জন-মানুষের জীবিকা, সংস্কৃতি ও জীবন-চর্যার ইতিহাস। সবশেষে বলা প্রয়োজন যে, ঢাকায় যেহেতু কেবল বিক্রমপুর থেকেই অভিবাসন ঘটেনি সেহেতু বিক্রমপুরের উপভাষার অনুরূপ মানিকগঞ্জ, জয়দেবপুর, নারায়ণগঞ্জসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন উপভাষার ভাষিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে কুট্টিভাষার তুলনামূলক আলোচনা করে ঢাকার জন-মানুষ ও নগরায়ণ চর্চার ইতিহাসকে আরও সমৃদ্ধ করা সম্ভব।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. Howard Zinn, *A People's History of the United States (1492-present)*, First perennial classics (ed.), (Harper Collins, 2001), p. 74

২. Bengt Nordberg, *The Sociolinguistics of Urbanization: The Case of the Nordic Countries*, (Berlin: Walter de Gruyter. 1994), p. 01

৩. Ronald Wardhaugh, *An Introduction to Sociolinguistics* (Oxford: Blackwell Publishers, 1998), p.07

৪. আরও দেখা যেতে পারে – J.A. Fishman, *Reversing Language Shift: Theoretical and Empirical Foundations of Assistance to Threatened Languages*. (Clevedon: Multilingual Matters. 1991); David Crystal, *Language Death*. (Cambridge University Press: Cambridge, 2000); C. Moseley, (2007). General introduction, In *Encyclopedia of the World's Endangered Languages*, C. Moseley (ed.), vii-xvi. London/New York: Routledge, 2007); L.A. Grenoble, Endangered languages, In *Concise Encyclopedia of Languages of the World*, K. Brown and S. Ogilvie (eds.), (Oxford: Elsevier., 2009) P. 317-327

৫. শামসুর রাহমান, *স্মৃতির শহর* (ঢাকা : সাহিত্য বিলাস, ২০০৯), পৃ. ৫৪

৬. মনিরুজ্জামান, 'পরিবর্তনশীল ঢাকার ভাষা', *ঢাকাই উপভাষা প্রবাদ প্রবচন কৌতুক ও ছড়া*, সম্পা. ফিরোজা ইয়াসমীন (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১০), পৃ. ১৪৩-১৪৪

৭. রফিকুল ইসলাম, 'ঢাকাই উপভাষার ঐতিহাসিক বিবর্তন', *ঢাকাই উপভাষা প্রবাদ প্রবচন কৌতুক ও ছড়া* সম্পা., তদেব, পৃ.৫২

৮. George Ritzer, *Encyclopedia of Social Theory*. (New York: Sage Publication, 2004), p. 853

৯. Anthony Gramsci. *Selections from the Prison Notebooks*, edited and translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith. (London: Lawrence and Wishart, 1971), p. 20

১০. Michel Foucault. Power, in *Essential works of Foucault*, 1954-1984, Vol-3, ed. James D. Faubion, (London: Penguin Books, 2000), p. XXIX

১১. *Ibid.*

১২. E.H. Louai, Retracing the concept of the subaltern from Gramsci to Spivak: Historical developments and new applications. *African Journal of History and Culture (AJHC)* (Vol. 4(1), pp. 4-8, 2012) [Available online at http://www.academicjournals.org/AJHC DOI: 10.5897/AJHC11.020 ISSN 2141-6672]

১৩. Ranajit Guha. "On Some Apects of the Historiography of Colonial India", *Subaltern Studies*, Ranajit Guha ed., Vol. VII (Oxford :1982), pp.1-8

১৪. Gayatri Chakravorty Spivak, Subaltern Studies: Deconstructing Historiography, Ranajit Guha ed., *Subaltern Studies*, Vol. IV, (Delhi:Oxford University Press, 1985), p. 197-198

১৫. সালাউদ্দিন আইয়ুব, 'সাব অলটার্ন ইতিহাস জিজ্ঞাসা', *সংস্কৃতির জিজ্ঞাসা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯), পৃ.৫৬

১৬. রণজিৎ গুহ, 'ভূমিকা', *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, সম্পা. পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও গৌতম ভদ্র (কলিকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০১), পৃ.০৩

১৭. হাকিম হাবিবুর রহমান, *আসূদেগানে ঢাকা ঢাকায় যাঁরা সমাহিত*, অনুবাদ ও সম্পাদনায় মাওলানা আকরাম ফারুখ ও মাওলানা আ. ন. ম. রুহুল আমিন চৌধুরী (ঢাকা : মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯০), পৃ.৪২

১৮. Syed Muhammed Taifoor. *Glimpses of old Dhaka: a short historical narration of East Bengal and Aassam with special treatment of Dhaka*, (S. M. Perwez, Dhaka, 1956), p. 79

১৯. হাকিম হাবিবুর রহমান, পূর্বোক্ত।

২০. আরও দেখা যেতে পারে, নীলিমা ইব্রাহিম, 'ঢাকাই রসিকতা', *সাহিত্য পত্রিকা* (বর্ষা সংখ্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৮০),পৃ.১৪৬; বিস্তারিত দেখা যেতে পারে–A. M. Chowdhury and Fariqui S., 'Physical Growth of Dhaka City', in Sharif Uddin Ahmed (ed), *Dhaka Past Present Future* (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2009), p.61-69;

২১. শরিফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা ইতিহাস ও নগর জীবন ১৮৪০-১৯২১* (ঢাকা : একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লি., ২০০১), পৃ. ১৪৪

২২. হাকিম হাবিবুর রহমান, পূর্বোক্ত।

২৩. নীলিমা ইব্রাহিম, পূর্বোক্ত।

২৪. মনিরুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫২

২৫. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, *ঢাকার ইতিবৃত্ত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি* (ঢাকা : গতিধারা, ২০০৮), পৃ.৪৪

২৬. তদেব।

২৭. মনিরুজ্জামান, পূর্বোক্ত।

২৮. W. Samarin, *Field Linguistics* (New York: Holt, Rinhard & Winston, 1967)

২৯. রাজীব হুমায়ুন, 'পুরোনো ঢাকার বাংলা ভাষা', *ঢাকাই উপভাষা প্রবাদ প্রবচন কৌতুক ও ছড়া* সম্পা. ফিরোজা ইয়াসমীন (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১০), পৃ. ৮৮

৩০. *Ibid.*; আরও দেখা যেতে পারে– মুহম্মদ আবদুল হাই, 'ঢাকাই উপভাষা', *সাহিত্য* পত্রিকা, বর্ষা সংখ্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৭২

৩১. W Samarin, *Ibid.*

৩২. রাজীব হুমায়ুন,পূর্বোক্ত।

৩৩. ফিরোজা ইয়াসমীন,(সম্পা.), *ঢাকাই উপভাষা প্রবাদ প্রবচন কৌতুক ও ছড়া* (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১০), পৃ. ২৩২-২৭০

৩৪. শামসুজ্জামান খান, (সম্পা.), *বাংলা একাডেমি: বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির গ্রন্থমালা-মুন্সিগঞ্জ*। (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১৪), পৃ. ১৫৬-১৬৪

৩৫. Ranajit Guha, *Ibid.*

৩৬. Anthony Gramsci, *Ibid.*

৩৭. Gayatri Chakravorty Spivak, 'Can the Subaltern Speak?', *Colonial Discourse and Post-Colonial Theory*, eds. P. Williams and L. Chrisman, (Columbia University Press, New York, 1992). pp. 66-111

৩৮. J. Maggio, 'Can the Subaltern Be Heard?', Political Theory, Translation, Representation, and Gayatri Chakravorty Spivak. *Alternatives: Global, Local, Political*, Vol. 32, No. 4, 2007, pp. 419-443

৩৯. রাজীব হুমায়ুন,পূর্বোক্ত, পৃ.৭৬-৭৯